# ইসলামী সভ্যতা
## বনাম
# পাশ্চাত্য সভ্যতা

প্রফেসর হান্টিংটন রচিত The Clash of Civilizations
গ্রন্থের যুক্তিসমৃদ্ধ পর্যালোচনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

# ইসলামী সভ্যতা

## বনাম

# পাশ্চাত্য সভ্যতা

প্রফেসর হান্টিংটন রচিত 'The Clash of Civilizations'
গ্রন্থের যুক্তিসমৃদ্ধ পর্যালোচনা

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

www.amarboi.org

ষষ্ঠ মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১
পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৪

ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত ❖ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : বারো টাকা মাত্র

www.amarboi.org

# এ পুস্তকের পটভূমি

আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর Samuel P. Huntington রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order' ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনকালে তিনি আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে নিরাপত্তা পরিকল্পনার ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি আমেরিকান পলিটিক্যাল সাইন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

আমেরিকার রাষ্ট্র-পরিচালকদের নিকট তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তিনি সে দেশের নীতি-নির্ধারকদের নিকট পথ প্রদর্শক হিসেবে গণ্য। তার চিন্তাধারা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করে।

তার উপরিউক্ত পুস্তকে তিনি গর্বের সাথে উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এ সভ্যতা বিশ্বজনীনতা অর্জন করতে যাচ্ছে। গোটা বিশ্ব এ সভ্যতায় প্রভাবান্বিত।

তিনি অত্যন্ত গর্বিত যে, সেক্যুলার লিবারেল ডেমোক্রেসি আমেরিকার নেতৃত্বে এখন সর্বজনীন মর্যাদা লাভ করেছে। বিশেষ করে সোভিয়েট-রাশিয়ার পতনের পর পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র গোটা বিশ্বে আদর্শ হিসেবে গণ্য।

গ্রন্থটিতে তিনি দুটো প্রবন্ধে ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানের প্রবল আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের অগ্রগতিকে তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র হুমকি বলে ঘোষণা করেছেন। পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ার পথে ইসলামী সভ্যতা বিরাট প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে বলে তিনি রাষ্ট্রনায়কদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তার মতে, সমাজতন্ত্র একটি সাময়িক সমস্যা ছিলো, যা উত্থানের ৭০ বছর পরই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম দেড় হাজার বছর থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধাবার শক্তি একমাত্র ইসলামী সভ্যতার মধ্যেই বিদ্যমান। তাই নতুন বিশ্বব্যবস্থা নির্মাতাদের ইসলামী সভ্যতার উত্থানকে প্রতিহত করার বলিষ্ঠ পরিকল্পনা নিতে হবে।

আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের পিতা সিনিয়র বুশের শাসনামল থেকেই উপরিউক্ত পলিসি অনুযায়ী কাজ শুরু করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিকস ভেঙে যায় এবং আমেরিকা একমাত্র পরাশক্তির মর্যাদা লাভ করে। তখন থেকেই আমেরিকা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে একমাত্র প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজন বোধ করে।

ইরানে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সফল হয় এবং আমেরিকার পোষ্য শাহানশাহ পাহলভির পতন হয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে ঠেকাবার জন্য

www.amarboi.org

আমেরিকা ইরাকের সামরিক স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসাইনকে ইরান আক্রমণে সাহায্য করে। দীর্ঘ আট বছর যুদ্ধ করেও সাদ্দাম ইরানকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। ইরাকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সাদ্দামকে কুয়েত দখল করতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন সিনিয়র বুশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। সাদ্দামকে ফাঁদে ফেলে বুশ কুয়েতকে উদ্ধার করা ও সৌদী আরবকে সাদ্দামের হামলা থেকে রক্ষা করার অজুহাতে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদেরকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে, কার্যোদ্ধারের পর তাদেরকে ব্যবহৃত টয়লেট পেপারের মতো ছুড়ে ফেলে দেয়। তাই সাদ্দামের সাথে ঐ আচরণই করা হয়েছে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনাকে উপলক্ষ বানিয়ে জর্জ বুশ প্রফেসর হান্টিংটনের দেওয়া ব্লুপ্রিন্ট বাস্তবায়নে সিরিয়াস হয়ে তৎপরতা শুরু করে দেন। ২০০৪-এর নভেম্বরে জর্জ বুশকে পুনর্নির্বাচিত করে আমেরিকার অধিকাংশ জনগণ হান্টিংটনের থিউরিকেই সমর্থন জানায়।

আমি এ পুস্তিকাটিতে ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছি যে, ইসলামী সভ্যতাই মানবজাতিকে শান্তি ও কল্যাণ দিতে সক্ষম। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবতার বদলে পশুত্বেরই বিকাশ ঘটায়। মানবজাতিকে কল্যাণকর কিছু দেবার সাধ্য তাদের নেই। তারা দুটো বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে। এখন তাদের তৎপরতার পরিণাম অনিবার্যভাবেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়।

আমি পর্যাপ্ত উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতিকে মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা Divine Guidance-এ বিশ্বাস করে না বলে তাদের নৈতিকতার মান পশুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তাদের উন্নতিকে তারা বিশ্বে কর্তৃত্ব হাসিলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। মানবিক মূল্যবোধের কোন মূল্য তাদের নিকট নেই। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে তারা যা করছে তা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়, জঘন্য পশুত্ব।

মুসলিম উম্মাহ যদি তাদের পূর্বমর্যাদা বহাল করতে চায় তাহলে ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সব দেশে ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে। তা না হলে গোটা উম্মাহকে আরও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিম মিল্লাতকে যথাযথ চেতনা দান করুন।

গোলাম আযম
৩০ রমাদান ১৪২৫
১৪ নভেম্বর ২০০৪

www.amarboi.org

## সূচিপত্র


ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা ৭
সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৭
দু'সভ্যতার লড়াই ৮
মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয় ৯
ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ৯
একবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার দ্বন্দ্ব ১০
ইসলাম ও পাশ্চাত্য ১১
হান্টিংটন সম্পর্কে ১২
হান্টিংটনের সাথে আমি একমত ১৩
পাশ্চাত্য সভ্যতা, না খ্রিষ্ট সভ্যতা? ১৪
ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য ১৫
প্রথমতঃ Divine Guidance প্রয়োজন কিনা ১৫
দ্বিতীয়তঃ নির্ভুল জ্ঞানের উৎস কী? ১৭
তৃতীয়তঃ গণতন্ত্র কি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ? ১৮
চতুর্থতঃ বস্তুই কি সব কিছু? ১৯
কৌতুকের বিষয় ২০
পঞ্চমতঃ আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে ২০
ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য (সারকথা) ২১
আমেরিকার বর্তমান অভিযান ২৪
সন্ত্রাস দমনের অজুহাত ২৫
মুসলিম উম্মাহর আসল সংকট ২৬
হান্টিংটনের দাবি ২৮
পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতিকে আর কী দিতে পারবে? ২৯
তথাকথিত লিবারেল ডেমোক্রেসিই পাশ্চাত্য সভ্যতার একমাত্র মূলধন ৩১
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি মুসলিম বিশ্বেরও কর্তা ৩২


www.amarboi.org

# ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা

সভ্যতা শব্দটি বর্বরতার বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। Civilization এর বিপরীত Barbarism. যারা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে ও মরু অঞ্চলে বসবাস করে, যাযাবর হিসেবে জীবিকার সন্ধানে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত হতে থাকে, স্থায়ীভাবে কোথাও ঘরবাড়ি নির্মাণ করে না এবং কোন কিছু উৎপাদন করে না, প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, দলবেঁধে থাকা সত্ত্বেও এ জাতীয় লোকদেরকে অসভ্য ও বর্বর (Uncivilized, Barbarian) বলা হয়।

সভ্য বলতে তাদেরকেই বুঝায়, যারা স্থায়ীভাবে কোন এলাকায় বসতি স্থাপন করে, বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে, রাস্তা-ঘাট তৈরি করে, জীবন-যাপনের মান বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা করে, প্রকৃতির সম্পদকে ব্যবহার করে খাদ্য, পোশাক ও জীবনকে আরামদায়ক করার উদ্দেশ্যে বহু কিছু উৎপাদন করার চেষ্টা করে, লেখা ও পড়ার চর্চা করে ইত্যাদি।

এককালে মিসরীয় সভ্যতাকেই প্রাচীনতম মনে করা হতো। ১৯ শতাব্দীতে সিন্ধুদেশে মৃত্তিকা খনন করে মুহেনজদারো ও হরপ্পা নামক দুটো শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ার পর ধারণা করা হয় যে, মানব সভ্যতা আরও দশ হাজার বছরের প্রাচীন। আমি ঐ দুটো শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখার সময় ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি বিভাগের কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে, এতো প্রাচীনকালে নির্মিত ঐ শহরে দেখা যায় যে, রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বাড়ি ছিলো, পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন সিস্টেম ছিলো, বাড়ির সাথে সেনিটারি লেট্রিন ও বাথরুম ছিলো। অর্থাৎ এ সবই সভ্যতার নিদর্শন। ঐ সময়কার ব্যবহৃত মাটির তৈরি মযবুত পাত্র, কলসি, ধাতুর তৈরি গ্লাস এবং পেয়ালাও যাদুঘরে দেখালো। এভাবেই অসভ্য ও সভ্য মানব সমাজের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

## সভ্যতা ও সংস্কৃতি

বিশ্বজগৎ ও মানব জীবন সম্পর্কে সকল মানুষের ধারণা এক রকম নয়। এ পৃথিবী কেমন করে সৃষ্টি হয়ে গেলো, কোন স্রষ্টা আছে কি, বিশাল প্রাকৃতিক জগৎ কিভাবে চলছে, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা কিভাবে অবস্থান করছে, বস্তু জগতে কখন কিভাবে প্রাণের সঞ্চার হলো ইত্যাদি অগণিত প্রশ্ন মানুষের চিন্তাশীল মনে জাগা স্বাভাবিক। এ সবের উত্তর তালাশ করতে গিয়ে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে বহু রকম আকীদা-বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। এসব মৌলিক বিশ্বাসই বিভিন্ন সভ্যতার ভিত্তি। বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণেই এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতা ভিন্ন।

জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হয়ে যায়। বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা? তাঁর পরিচয় কী? তাঁর সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা? কী ধরনের


www.amarboi.org

সম্পর্ক আছে? তিনি কী উদ্দেশ্যে এ বিশ্ব সৃষ্টি করলেন? মানুষকেই বা কেন পয়দা করলেন? তিনি মানব জীবন পরিচালনার জন্য কোন বিধিবিধান দিয়েছেন কিনা? স্রষ্টার নিকট থেকে কোন বিধিবিধানের প্রয়োজন আছে কিনা? মৃত্যু কী? মানুষ কি মরে শেষ হয়ে যায়? মৃত্যুর পরও কি আর কোন জগৎ আছে?

এ সব প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। মানুষ এ সব প্রশ্নের জওয়াব সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে। এ সবের সমন্বিত ও ধারাবাহিক জওয়াব সবার নিকট এক রকম নয়। তাই এ সবের ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিশ্বাসও এক রকম হতে পারেনি।

বিশ্বাসের পার্থক্যের ভিত্তিতেই বিভিন্ন রকম জীবনাচার, সামাজিক রীতিনীতি, জীবন যাপন পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের বাহ্যিক রূপকেই সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলা হয়। সভ্যতা হলো মূল কাঠামো, সংস্কৃতি এর বাহ্যিক প্রকাশ। যেমন– একটি দালানের মূল কাঠামো প্রথম খাড়া করা হয়। এরপর এতে বসবাস করার জন্য প্রয়োজনীয় সজ্জা ও আসবাবপত্র ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। মূল কাঠামোকে সভ্যতা বলা যায়। আর বাকি সবই সংস্কৃতি ও কৃষ্টি।

## দু'সভ্যতার লড়াই

কোন সভ্যতা যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন তা একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করে। এর নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থা, আইনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, সামরিকশক্তি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এ রাষ্ট্রটির পরিধি বিস্তার লাভ করে বিশাল সাম্রাজ্যেও পরিণত হতে পারে।

অপর একটি সভ্যতা যদি পৃথকভাবে গড়ে ওঠে তাহলে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বা সাম্রাজ্যের সাথে এর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। একটি রাষ্ট্র প্রাধান্য বিস্তার করে এক ধরনের সভ্যতার ধারক ও বাহকের ভূমিকা পালন করছে। আর একটি ভিন্ন ধরনের সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক রাষ্ট্র গড়ে উঠলে ওটাকে নতুন হুমকি হিসেবে বিবেচনা করাই স্বাভাবিক। এভাবেই সভ্যতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

৭ম শতাব্দীতে আরবে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র সুসংগঠিত হলে রাসূল (স) ঐ সময়কার দুটো সভ্যতার ধারক ও বাহকের নিকট চিঠি দিয়ে ইসলামী সভ্যতা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। 'হলি' রোমান এম্পায়ার ও পারশিয়ান এলাকা ঐ সময়কার দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য ও সভ্যতা। রাসূল (স)-এর যুগেই এ দু'সভ্যতার মধ্যে সংঘাত হয় এবং প্রথমে রোম পরাজিত হয়। কিন্তু ৮/১০ বছরের মধ্যেই রোম আবার বিজয়ী হয়। সূরা রূমের শুরুতেই এ সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

ইসলামী সভ্যতার পক্ষ থেকে দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছার পর তাদের পক্ষে নতুন এ সভ্যতাকে প্রতিরোধ করাই স্বাভাবিক ছিলো। দেখা গেলো ইসলামী সভ্যতার সাথে সংঘর্ষে পুরাতন উভয় সভ্যতাই পরাজিত হয়ে গেলো। পারস্য সভ্যতা আর


www.amarboi.org

নতুন করে দাঁড়াতেই পারেনি। কিন্তু রোমের খ্রিস্টান সভ্যতা আবার সুসংগঠিত হয়ে ইসলামী সভ্যতার সাথে দীর্ঘ সংঘাতে লিপ্ত হয়।

ইতিহাসের এসব ঘটনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, সভ্যতা সভ্যতায় সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্ব অনিবার্য।

## মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয়

১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা উন্নত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের অধিকারী হয়ে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র প্রয়োগ করে ইসলামী সভ্যতার দুর্বল ধারক ও বাহক মুসলিম নেতৃত্বকে পরাজিত করে চরম হিংস্রতার পরিচয় দেয়। মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতার নিকট দীর্ঘ ক্রুসেডে তারা খ্রিস্টীয় সভ্যতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পায়। মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের প্রাধান্যকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মুসলিম দেশগুলো একে একে পাশ্চাত্যের গোলামি থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের আদর্শিক গোলামি অব্যাহতই থাকে। কারণ দেড় থেকে দু'শ' বছর বিদেশী শাসকরা তাদের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠা শিক্ষিত ঐ লোকদেরকেই সকল বেসামরিক ও সামরিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করে, যারা জন্মগতভাবে বিদেশী না হলেও চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে বিদেশীদেরই অন্ধ অনুসারী। ফলে দেশ স্বাধীন হলেও ইসলামী সভ্যতা বিকাশ লাভ করতে পারেনি। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক চিন্তাধারাই বহাল থেকে যায়। শিক্ষাব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, সশস্ত্র বাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য বিদেশীদের রেখে যাওয়া পদ্ধতিতেই চলতে থাকে। যোগ্য বিদেশী শাসকরা চলে যাবার পর দেশী শাসকরা তেমন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি বলে সর্বক্ষেত্রেই মান নিম্নগতি লাভ করে।

## ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে মাওলানা মওদূদীর রচিত "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" নামক ধারাবাহিক লেখার মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষিত মহল ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলগত পার্থক্য সম্পর্কে নবচেতনা লাভ করতে থাকে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে যেসব পাঠ্য ও অনুমোদিত গ্রন্থ আমাকে অধ্যয়ন করতে হয়েছে তা সবই পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের রচিত। ক্লাসে অধ্যাপকগণ ঐ সব বই থেকেই শিক্ষাদান করেছেন। তাই সেক্যুলারিজম (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ), ম্যাটেরিয়েলিজম (জড়বাদ বা বস্তুবাদ), ডাইলেকটিজম


www.amarboi.org

(দ্বন্দ্ববাদ) ইত্যাদি মতবাদে আমার চিন্তাধারা গড়ে উঠলো। এ সবের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি আয়ত্ত করলাম। এ সবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি অধ্যাপকগণও পেশ করেননি।

১৯৫৪ সালে আমার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর মাওলানা মওদূদীর "ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব" শিরোনামে রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ঐ সব পাশ্চাত্য মতবাদের সাথে ইসলামের মৌলিক চিন্তাধারার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পেলাম। পূর্বে যা আমার বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল তা ত্যাগ করা সহজ ছিলো না। কিন্তু ম্যাওলানা মওদূদীর বলিষ্ঠ যুক্তি ঐ সব পাশ্চাত্য মতবাদের অসারতা ও ভ্রান্তি আমাকে অভিভূত করে। ঐ সব ভ্রান্ত মতবাদ গোটা শিক্ষিত সমাজকে ইসলাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট কার্যকর।

১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের অবসান হয়। কিন্তু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একবিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষার্থীদেরকে ঐ সব মতবাদেই দীক্ষিত করা হচ্ছে। আর এ শিক্ষিত লোকেরাই দেশ পরিচালনা করছে। তাই বিদেশী ইংরেজরা চলে গেলেও উপমহাদেশে দেশী ইংরেজদের শাসনই অব্যাহত রয়েছে।

## একবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার দ্বন্দ্ব

সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of Civilization) কথাটি গত এক দশক থেকে বিদগ্ধ মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সেম্যুয়েল পি. হান্টিংটনের লেখা 'The Clash of Civilizations' নামে গ্রন্থটির কারণেই হয়তো এ বিষয়ে এতো চর্চা হচ্ছে।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত এ বইটি ১৯৯৯ সালে আমার আমেরিকা সফরের সময় শিকাগোতে আসাদ নামে ইসলামী আন্দোলনের এক কর্মী আমাকে উপহার দেন। ৩২০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থটিতে লেখক ৫টি চ্যাপ্টারে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সংঘাত সম্পর্কে ইতিহাস থেকে বহু উদাহরণ পেশ করেছেন।

গ্রন্থটির পুরো নাম "The Clash of Civilizations And The Remaking of World Order" এ নামকরণ থেকেই লেখকের আসল লক্ষ্য চিহ্নিত করা যায়। নামের দ্বিতীয় অংশটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোটা বিশ্বের ব্যবস্থাপনাকে নতুন করে গড়ার পরিকল্পনা নিয়েই গ্রন্থটি রচিত।

তিনি গৌরবের সাথেই উল্লেখ করেছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন এবং এ সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা। এ সভ্যতার উপর হুমকি আসছে ইসলামী পুনরুত্থান আন্দোলন (Islamic Resurgence) থেকে। তাই আমেরিকার নেতৃত্বেই বিশ্ব ব্যবস্থাকে (World Order) নতুন করে গড়ে তুলতে হবে।


www.amarboi.org

বইটির দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের শিরোনাম হলো "The Shifting Balance of Civilization" (বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ভারসাম্যের স্থানান্তর)। এ চ্যাপ্টারের একটি প্রবন্ধ হলো "The Islamic Resurgence" (ইসলামের পুনরুত্থান)। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই Resurgence শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর বদলে তিনি Renaissance শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন। রেনেসাঁ মানে নবজাগরণ। আর রিসার্জেন্স মানে পরাজিত শক্তির পুনরুত্থান। তাঁর মতে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ইসলামী সভ্যতা পরাজিত হওয়ার পর আবার পুনরুত্থানের আন্দোলন চলছে। এ প্রবন্ধে মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের যে সুসংগঠিত রূপ দেখা যাচ্ছে এর বিবরণ তুলে ধরে তিনি শঙ্কিত হচ্ছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য এটা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও সকল অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম দেশগুলো থেকে বিপুলসংখ্যক মুসলিমের স্থায়ীভাবে বসবাস করার উল্লেখ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের সংগঠনগুলোতে আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের বিরাট সংখ্যায় অংশগ্রহণ, তাদের আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়া এবং তাদের সেবামূলক কাজ দ্বারা জনগণের মধ্যে তাদের প্রভাব বৃদ্ধির বিবরণও তিনি দিয়েছেন। কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্রে সরকারের উপরও তাদের প্রভাব পড়ছে বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে কয়েকটি উদাহরণও পেশ করেছেন। এ প্রবন্ধটি ১০৯ থেকে ১২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত।

## ইসলাম ও পাশ্চাত্য

বইটির চতুর্থ চ্যাপ্টারের শিরোনাম 'Clash of Civilizations' (সভ্যতাসমূহের মধ্যে সংঘাত)। এ চ্যাপ্টারে 'Islam and The West' শিরোনামে ২০৯ পৃষ্ঠা থেকে ১০টি পৃষ্ঠায় তিনি এ কথাই জোর দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ এমন দুটো সভ্যতা যাদের মধ্যে গত দেড় হাজার বছর থেকেই সংঘাত চলছে। প্রবন্ধটির প্রথম বাক্য ও শেষ প্যারা থেকে লেখকের চিন্তাধারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম বাক্যটি নিম্নরূপ : "Some Westerners, including President Bill Clinton, have argued that the west does not have problems with Islam, but only with violent Islamist extremists. Fourteen hundred years of history demonstrate otherwise."

(কতক পশ্চিমা লোক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনসহ (ক্লিনটন ক্ষমতায় থাকাকালে লেখা) যুক্তি দেন যে, ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের কোন বিরোধ নেই। সমস্যা শুধু চরমপন্থি আগ্রাসী ইসলামপন্থিদের সাথে। কিন্তু গত ১৪শ' বছরের ইতিহাস ভিন্ন কথাই প্রমাণ করে।)


www.amarboi.org

প্রবন্ধটির শেষ প্যারা নিম্নরূপ ঃ

"The underlying Problem for the west is not Islamic Fundamentalism. It is Islam a different civilization whose people are convinced of the superiority of their culture and one obsessed with the inferiority of their power. The problem for Islam is not the CIA or the U. S. Department of Defense. It is the West a different civilization whose people are convinced of the Universality of their culture and believe that their superior. if declining. power imposes on them the obligation to extend that culture throughout the world. These are the basic ingredients that fuel conflict between Islam and the West."

(পাশ্চাত্যের জন্য ইসলামী মৌলবাদ মৌলিক সমস্যা নয়। ইসলামই আসল সমস্যা, যা একটি ভিন্ন সভ্যতা, যার জনগণ তাদের কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তারা ক্ষমতার দিক দিয়ে পেছনে পড়ে আছে বলে আবেগতাড়িতভাবে সচেতন। সি. আই. এ (আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা) বা আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ ইসলামের জন্য কোন সমস্যাই নয়। পাশ্চাত্যই হলো ইসলামের জন্য আসল সমস্যা যা একটি ভিন্ন সভ্যতা, যার জনগণ দৃঢ় প্রত্যয়ী যে, তাদের কৃষ্টি বিশ্বজনীন। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ক্ষমতার প্রাধান্য (যদি তা ক্ষুণ্ন হয়) তাদের উপর এ কর্তব্য আরোপ করে, যেন তারা তাদের কৃষ্টিকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করে দেয়। এসবই হলো মৌল উপাদান যা ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংঘাতের ইন্ধন যোগায়।) If declining কথাটি রহস্যময়।

## হান্টিংটন সম্পর্কে

প্রফেসর হান্টিংটন শুধু একজন প্রফেসরই নন; উক্ত বইটির ব্যাক-কভারে তার পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে ঃ তিনি প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের শাসনকালে National Security Council (জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ) এর Director of Security Planning ছিলেন। ঐ সময় তিনি Foreign Policy নামক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও Co-editor এবং আমেরিকান পলিটিকেল সাইন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

এ পরিচয় থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আমেরিকার নিরাপত্তা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ও অভিমত সরকারের বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে।

বইটির কভারে প্রথমেই লেখা National Best,Seller. অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে বইটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বিক্রয় হয়েছে। কভারের সর্বনিম্নে The Wall Street Journal নামে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ম্যাগাজিনে বইটি সম্পর্কে সার্টিফিকেট দেওয়া



www.amarboi.org

হয়েছে ঃ "The book is dazzling in its scope and grasp of the intricacies of contemporary global politics." (সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির জটিলতা অনুধাবন করা ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে এ বইটি অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা) অর্থাৎ বিশ্ব রাজনীতিকে সঠিকভাবে বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ বইটি পথপ্রদর্শক।

ব্যাক-কভারে বইটি সম্পর্কে যাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, এর মধ্যে সর্বপ্রথম আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বনামখ্যাত ইহুদী হেনরী কিসিঞ্জার। তিনি বলেন, "Sam Huntington, One of the West's most eminent political scientists, Presents a challenging framework for understanding the realities of global politics in the next century. 'The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order' is one of the most important book to have emerged since the end of the cold war."

(হান্টিংটন, যিনি পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। আগামী শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিকে অনুধাবন করার জন্য একটি আগ্রাসী কাঠামো পরিবেশন করেছেন। (সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে আমেরিকার) স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর এ বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হান্টিংটন বইটিতে এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, কমিউনিজমের মোকাবিলা করার জন্য স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকা ইসলামকে সহায়ক বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করায় তৈলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলো ইসলামের পুনরুত্থান আন্দোলনকে বিপুল সাহায্যদান করেছে। অথচ স্নায়ুযুদ্ধ একটি সাময়িক সমস্যা ছিলো। আর ইসলাম হলো চিরস্থায়ী সমস্যা।

## হান্টিংটনের সাথে আমি একমত

প্রফেসর হান্টিংটনের সাথে আমি দুটো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করি ঃ

১. ইসলামী মৌলবাদ বা মিলিটেন্ট ইসলাম পাশ্চাত্যের জন্য আসল হুমকি নয়। ইসলাম একটি জীবন বিধান হিসেবেই প্রধান হুমকি। আমেরিকার নেতৃবৃন্দ অবশ্য কূটনৈতিক চাল হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন না; কিন্তু মৌলবাদী বলে গালি দিয়ে তারা আসলে ইসলামের বিরুদ্ধেই ক্রুসেডে নেমেছেন। তারা দেখতে পাচ্ছেন যে, সুসংগঠিত কোন ইসলামী আন্দোলনই শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামকে বিজয়ী করার কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। তারা জনগণকে সংগঠিত করে গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কাজ করছে।

বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে আমেরিকা ইসলামের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে স্বৈরশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রতিক্রিয়ায় কিছু যুবক গেরিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। স্বৈরশাসকরাও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এ জাতীয় গ্রুপকে ময়দানে ছেড়ে দিয়ে দমননীতি চালাবার অজুহাত সৃষ্টি করছে এবং এ অজুহাতে ইসলামের



www.amarboi.org

পুনরুত্থান আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখছে। আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য সভ্যতা একই অজুহাত দেখিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে নেমেছে।

২. হান্টিংটনের এ মতের সাথেও আমি একমত যে, ইসলাম একটি ধর্ম হিসেবে খ্রিস্টধর্মের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত নয়। মুসলিম দেশে যেমন খ্রিস্টানরা অবাধে তাদের ধর্ম পালন করছে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতেও মুসলমানরা তেমনি তাদের ধর্ম পালন করছে। তাই কোথাও ধর্মে ধর্মে কোন বিরোধ ও সংঘাত দেখা যায় না। অবশ্য ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংসের পর পাশ্চাত্যে ধর্মপালনকারী মুসলিমদের মসজিদ ও মাদরাসাকে মৌলবাদীদের আঁখড়া বলে সন্দেহ করছে এবং তল্লাশি চালাচ্ছে। এমনকি মুসলিম ছাত্রীদের মাথা ঢেকে রাখার ধর্মীয় কর্তব্যকেও মৌলবাদী কর্ম হিসেবে আইন করে নিষিদ্ধ করছে।

হান্টিংটনের মতে, ইসলাম একটি সভ্যতার ধারক হিসেবেই পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য হুমকি। আমি তাঁর সাথে একমত যে, ইসলাম শুধু অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম নয়; ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে দশ-বারো শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বে একটি বিজয়ী সভ্যতা হিসেবে মানবজাতির নেতৃত্ব দিয়েছে। তাই কমিউনিজমের পতনের পর পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র ইসলামই হুমকি হতে পারে। আর কোন হুমকির অস্তিত্ব আছে বলে প্রমাণিত নয়।

## পাশ্চাত্য সভ্যতা, না খ্রিস্ট সভ্যতা?

হান্টিংটন খ্রিস্ট সভ্যতাকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা হিসেবে গণ্য করেন। খ্রিস্টধর্ম এককালে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে দাপটের সাথেই রাজত্ব করেছে। রোমান এম্পায়ার Holy (পবিত্র) নামেই খ্যাত ছিলো। চার্চের নামেই পোপরা শাসন করতো। আল্লাহর কিতাব অবিকৃত অবস্থায় না থাকায় গডের নামে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চার্চের পক্ষ থেকে মনগড়া যেসব অভিমত ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে গণ্য ছিলো, বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে তাদের বহু মতবাদ অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হতে লাগলো। কিন্তু শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সত্যকে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হলো। এমনকি কোন কোন বৈজ্ঞানিককে পুড়িয়ে শাস্তি দিলো। এভাবে খ্রিস্টধর্মের নামে অন্ধ কতক বিশ্বাসের সাথে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধ বাধলো। যৌক্তিক জ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্ধবিশ্বাস কেমন করে টিকতে পারে? এক পর্যায়ে চার্চ ও স্টেটের মধ্যে লড়াই বেধে গেলো। প্রায় দু'শ বছর এ 'আনহলি' যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত মার্টিন লুথার নামক এক আপসকামী নেতার প্রচেষ্টায় Conciliar Movement (আপস আন্দোলন) চলে এবং চার্চ ও স্টেটের মধ্যে আপস হয়।


www.amarboi.org

আপসে উভয়পক্ষ নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত মেনে নেয় ঃ

১. চার্চের যাবতীয় তৎপরতা শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। পার্থিব কোন বিষয়ে চার্চ হস্তক্ষেপ করবে না।

২. রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের হাতে কর্তৃত্ব থাকবে। তবে রাষ্ট্র চার্চকে শ্রদ্ধা করবে এবং সরকার চার্চে গিয়ে রাষ্ট্রীয় শপথ গ্রহণ করবে।

ক্ষমতাহীন চার্চকে এটুকু ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট করে রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলো এবং চার্চ চরম অপমান থেকে রক্ষা পেলো বলে সান্ত্বনাবোধ করলো। এভাবেই খ্রিস্টজগতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) কায়েম হয় এবং খ্রিস্টধর্ম শুধু ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এর পরিণামে খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মের বাস্তব প্রভাব খতম হয়ে গেলো।

বর্তমানে 'খ্রিস্টান সভ্যতা' কথাটি প্রচলিত নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতাই এখন খ্রিস্টজগতের গৌরবের ধন। খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল রাষ্ট্রই অবশ্য খ্রিস্টধর্মকে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। তারা বিরাট অংকের তহবিল গোটা বিশ্বে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ব্যয় করে। যত উপজাতি আছে তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সেবামূলক কাজ করে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। গত দুশ' বছরে এ দিক দিয়ে তারা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। পৃথিবীর ৬ শ' কোটি মানুষের মধ্যে অর্ধেকের বেশি খ্রিস্টান বলে তারা দাবি করছে। শতকরা ২/৩ জনও চার্চে যায় না, ধর্মের কোন ধারই ধারে না, তবু খ্রিস্টান দাবি করে এবং ক্রিস্টমাস উৎসব জাঁকজমকের সাথে পালন করে। রাজনৈতিক স্বার্থে তারা ধর্মকে এভাবেই ব্যবহার করছে।

'পাশ্চাত্য সভ্যতা' নামটিই অধিক সুবিধাজনক। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে যারা বসবাস করে তারা যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক বা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী না হোক, সবাইকে ঐ সভ্যতার ধারক হিসেবে দাবি করা সহজ হয়।

## ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক পার্থক্য

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সভ্যতার ভিত্তি হলো কতক মৌলিক বিশ্বাস যা বাস্তব জীবনে কৃষ্টি আকারে প্রকাশ পায়। ইসলামী সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### প্রথমতঃ Divine Guidance প্রয়োজন কিনা

ইসলাম ঘোষণা করে যে, মানবজাতি ও গোটা বিশ্বজগৎকে সুপরিকল্পিতভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। গোটা সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার ক্ষমতা একমাত্র মানবজাতিকেই তিনি দিয়েছেন। গোটা সৃষ্টিজগৎকে ব্যবহার করার উপযুক্ত হাতিয়ার



www.amarboi.org

হিসেবে মানবদেহ তৈরি করেছেন। তাই মানুষই বিজ্ঞানের চর্চা করে সৃষ্টজগৎকে ব্যবহারে এগিয়ে চলছে। ফেরেশতা ও জিন জাতি বিজ্ঞান চর্চা করে বলে প্রমাণিত নয়। মানবদেহটি আসল মানুষ নয়; বরং এটি একটি বস্তুসত্তা মাত্র। মানুষের মধ্যে যে নৈতিক চেতনা বা বিবেক রয়েছে সেটা বস্তুসত্তা নয়; সেটাই আসল মানুষ, মনুষ্যত্বের ভিত্তি।

ইসলাম শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। আল্লাহ তাআলা নবী ও রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে পৃথিবীতে জীবন-যাপনের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেছেন। ঐসব জ্ঞানের সমষ্টিই হলো দীন-ইসলাম বা ইসলামী জীবন বিধান। মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করবে, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামষ্টিক জীবন কিভাবে পরিচালনা করলে দুনিয়ার মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হবে এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পাবে সে বিষয়ে আল্লাহ নবী-রাসূলগণকে যে জ্ঞান দান করেছেন সেসবের সামষ্টিক নামই দীন-ইসলাম।

পাশ্চাত্য সভ্যতা Divine Guidance (আল্লাহর হেদায়াতের) কোন প্রয়োজনই বোধ করে না। ধর্মের নামে চার্চের অন্যায় ও যুলুমের দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তারা তাদের God-কে চার্চে বন্দি করে রেখেছে এবং চার্চের বাইরে আসার উপর ১৪৪ ধারার মতো নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। God-এর দোহাই দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করার ফলে তারা God-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তাই তারা God থেকে কোন Guidance নিতে রাজি নয়। তাদের কাছে God-এর বাণী হিসেবে যে বাইবেল রয়েছে তা তো মানব রচিত গ্রন্থ। ইনজীল কিতাব যে ভাষায় নাযিল হয়েছিলো বর্তমানে তার তো কোন অস্তিত্বই নেই। তাহলে God-এর Guidance তারা কোথায় পাবে?

তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিমূলেই বিশ্বস্রষ্টার কোন অবস্থান নেই। তাদের জ্ঞানের উৎস God নয়; ইতিহাসলব্ধ মানবজাতির অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং মানুষের মেধা, প্রজ্ঞা ও সাধনালব্ধ জ্ঞানই তাদের একমাত্র সম্বল। তাই তারা সেক্যুলার হতে বাধ্য।

আজ পর্যন্ত কুরআনের কোন জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কোন বিরোধ দেখা দেয়নি। কারণ বিজ্ঞান সৃষ্টিজগতের যে জ্ঞান সংগ্রহ করে তা যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, কুরআনও ঐ একই উৎস থেকে এসেছে। কুরআনের মতো কোন বিশুদ্ধ Divine Knowledge পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে নেই। বিশ্বে মুসলিম শাসনামলে কুরআনই বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা যুগিয়েছে। বর্তমানে মুসলিম জাতি কুরআনের জ্ঞান চর্চা না করায় পাশ্চাত্যের দুয়ারে জ্ঞানের ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে।


www.amarboi.org

## দ্বিতীয়তঃ নির্ভুল জ্ঞানের উৎস কী?

ইসলামের মতে, একমাত্র আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানই নির্ভুল ও শাশ্বত। বিশুদ্ধ জ্ঞান চিরন্তন সত্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান এক সময় আবার অশুদ্ধ হয়ে যায় না। তাই আল্লাহর দেওয়া নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে মানব জীবন পরিচালিত হলে কোন সময়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে না। মানুষের মেধা, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা যদি আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে অবলম্বন করে, তাহলে তারা যত জ্ঞান আহরণ করবে সবই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হবে। আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষ যত জ্ঞান চর্চা করে তাতে নির্ভুল জ্ঞানের নিশ্চয়তা নেই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই নির্ভুল জ্ঞান নেই। ব্যক্তি গঠন, পরিবার গঠন, সমাজ গঠন, রাষ্ট্রব্যবস্থা, সরকার পরিচালনা, অর্থনৈতিক বিধান, শিক্ষাব্যবস্থা, জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি অগণিত ব্যাপার রয়েছে, যেখানে নির্ভুল জ্ঞান না থাকার কারণে ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ভুল জ্ঞান প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেবার ফলে বাস্তবে সমস্যা দেখা দেয়। তখন নতুন করে জ্ঞান লাভ হয়। সে জ্ঞান প্রয়োগ করার পর আবার কোন সমস্যা দেখা দিলে নতুন জ্ঞানের ভিত্তিতে আবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এভাবেই মানবজাতি ভুল সংশোধন করে করেই জীবনের ঘানি টেনে চলেছে।

এ বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক হেগেল Dialectism (দ্বন্দ্ববাদ) নামক থিউরিটি পেশ করেন, যা পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি প্রধান ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। সহজ ভাষায় এ থিউরিটির বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

মানুষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তা-গবেষণা, সাধনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন জ্ঞানকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করে। এ জ্ঞানটি তখন থিসিস (Thesis) হিসেবে গণ্য হয়। যখন এ থিসিস বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় তখন অভিজ্ঞতায় কতক ভুল ধরা পড়ে। এ ভুলগুলোকে তিনি Anti-thesis নাম দিয়েছেন। Thesis ও Anti-thesis -এর এ দ্বন্দ্বে যা ভুল বলে প্রমাণিত তা বর্জন করে নতুন জ্ঞান সংযোজন করতে হয়। Thesis-এর মধ্যে যা নির্ভুল তা বহাল রেখে এবং যা ভুল তা পরিবর্তন করে নতুন জ্ঞানের সমন্বয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এর নাম তিনি দিয়েছেন Synthesis. এ সিনথিসিসটিই তখন নতুন Thesis-এর মর্যাদা পেলো। যখন এ নতুন থিসিসটি বাস্তবে প্রয়োগ করা হয় তখন আবার কতক ভুল ধরা পড়তে পারে। সে ভুলগুলো আবার নতুন এন্টি-থিসিস হিসেবে গণ্য হয়। থিসিস ও এন্টি-থিসিসের এ দ্বন্দ্বের পরিণামে আবার সিনথিসিস জন্ম নেয়।

হেগেলের মতে, এ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই ভুল সংশোধন করে করে (Trial and Error বা পরীক্ষামূলক চেষ্টা ও ভুল করে করে) মানব সভ্যতা উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে।


www.amarboi.org

পাশ্চাত্য সভ্যতা এ মতবাদকেই সঠিক বলে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস না করে আর উপায় কী? নির্ভুল জ্ঞানের নিশ্চয়তাই যখন নেই তখন বাধ্য হয়েই এ থিউরিকে স্বীকার করতেই হয়।

এভাবেই মানবজাতি চিরকাল ভুলের শিকার হয়ে বিশুদ্ধ পন্থা আবিষ্কার করতে করতেই এগুতে বাধ্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট আর কোন বিকল্প নেই।

এ থিউরির পরিণামে এমন এক বিশ্বাস জন্ম নেয়, যা অত্যন্ত মারাত্মক ও বিভ্রান্তিকর। আর তা হলো, পুরাতনকে পরিত্যাজ্য বলে বিশ্বাস করা। যেহেতু এন্টি-থিসিস হিসেবে যা ভুল হিসেবে ধরা পড়লো তা ত্যাগ করেই এগুতে হচ্ছে, সেহেতু যা পুরাতন হিসেবে পরিত্যাগ করা হয় তা চিরকালই পরিত্যাজ্য। এ থিউরি অনুযায়ী যা পুরানো তাকে কিছুতেই গ্রহণ করা চলে না। মানব সভ্যতা নতুনকে গ্রহণ করে করেই এগিয়ে চলছে, পুরানো চিন্তা, মত ও পথ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এ থিউরি যাদের মগজ দখল করে নিয়েছে তারা কুরআন সম্পর্কে এ মন্তব্য করতে বাধ্য যে, ১৪ শ' বছরের পুরানো জ্ঞান আধুনিক যুগে অচল। যা কিছু অতীত কালের, তা এ যুগে চলতে পারে না। এ সিদ্ধান্ত কত মারাত্মক! প্রাচীন চিন্তাধারা, জ্ঞান, মত ও পথ সবই বর্জনীয় বলে বিশ্বাস জন্মিলে যা নতুন তা যত ভ্রান্তই হোক, তা গ্রহণীয় বলেই বিবেচিত হতে বাধ্য।

অথচ এমন থিউরি যুক্তির কষ্টিপাথরে এক মুহূর্তও টিকে না। "সত্য কথা বলা ভালো, মিথ্যা বলা মন্দ"– এ চিন্তাটি কত প্রাচীন! প্রাচীন বলেই কি এ মহাসত্য পরিত্যাজ্য বলে কেউ দাবি করতে সাহস করবে? সকল মানবীয় গুণাবলিই জ্ঞানের ময়দানে প্রাচীন। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ সবই প্রাচীন। হয়তো এ কারণেই আধুনিকত্ব রোগে আক্রান্ত যারা তাদের নিকট নৈতিক মূল্যবোধের কোন মূল্যই নেই।

## তৃতীয়তঃ গণতন্ত্র কি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ

পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরবময় আদর্শ হলো Secular Democracy. এর তাৎপর্য হলো, সর্ব বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতকেই গ্রহণ করতে হবে। এমনকি নৈতিক বিষয়েও মেজরিটির রায়কেই সঠিক বলে মেনে নিতে হবে। কমিউনিজম সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্বে ৭০ বছর দাপটের সাথে ডেমোক্রেসির মোকাবিলা করেছে। মস্কোতেই কমিউনিজম আত্মহত্যা করে Secular Democracy-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পর পাশ্চাত্য সভ্যতা এ বিষয়ে মানবজাতির অনুসরণীয় একমাত্র আদর্শ বলে গর্ববোধ করছে।

ইসলাম গণতন্ত্রকে কোন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বলে স্বীকার করে না। সরকার গঠনের পদ্ধতি হিসেবে এবং পার্থিব যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পন্থা হিসেবে ইসলাম গণতন্ত্রকে


www.amarboi.org

সঠিক বলে মনে করে। কিন্তু নৈতিক মূল্যবোধও গণতন্ত্রের আওতায় পড়ে বলে ইসলাম কিছুতেই স্বীকার করে না। অধিকাংশ লোক মিথ্যা বলা ভালো বলে দাবি করলেও তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিবাহ ছাড়াই যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ বৈধ বলে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। এ দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা আরও অনেক এগিয়ে গেছে। কয়েকটি দেশে সমকামিতা বৈধ বলে আইনও হয়েছে। একই লিঙ্গের দু'জনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৈধ বলে স্বীকৃত হচ্ছে। অথচ কুকুর বিড়াল বা অন্য কোন পশুর মধ্যে সমকামিতা কখনও দেখা যায় না। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, Divine Guidance-কে অস্বীকার করলে মানুষ পশুর চেয়ে অধম হতে বাধ্য। কুরআনে আছে, "ওরা পশুর মতো, বরং এর চেয়েও পথভ্রষ্ট।"

**চতুর্থতঃ বস্তুই কি সব কিছু?**

Matter বা বস্তু বা জড়পদার্থ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যা কিছু দেখা যায়, ধরা যায়, যার অস্তিত্ব বাস্তবে টের পাওয়া যায় তাকেই বস্তু বলা হয়। খ্রিস্টধর্মের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ যখন চরমে পৌছে তখন দার্শনিক Hume দাবি করেন যে, বস্তুর উর্ধ্বে আর কিছু নেই। যদি থাকেও তা আমাদের প্রয়োজনে আসে না। এ মতবাদকেই Materialism বা বস্তুবাদ বা জড়বাদ বলা হয়।

বিজ্ঞান শুধু বস্তু ও বস্তুগত শক্তি (Matter and Material Energy) নিয়েই চর্চা করে। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে অত্যন্ত সহজেই প্রভাবান্বিত করে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার তো বাস্তব সত্য হিসেবেই ধরা দেয়। খ্রিস্টান পাদ্রিরা এ বিজ্ঞানের বিরোধিতা করার ফলে বিজ্ঞানে প্রভাবিত মানুষ ধর্মের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়। গড, বাইবেল, প্রফেট, পরকাল, দোযখ, বেহেশত ইত্যাদি যেহেতু বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে, সেহেতু এসবকে ধর্ম নেতাদের মনগড়া চিন্তার ফসল বলে উড়িয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। ধর্মের নামে অযৌক্তিক বাড়াবাড়িই ধর্মের বিরুদ্ধে এ বিদ্বেষ সৃষ্টি করে।

Hume এ মনোভাবটিকে দার্শনিকতার রূপ দান করে দাবি করেন যে, বস্তুর বাইরের কোন কিছুকে বিশ্বাস ও স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সেসব মানুষের বাস্তব জীবনে কাজে আসে না। তাই বস্তুবাদে যারা বিশ্বাসী তাদের নিকট আল্লাহ, রাসূল, ওহী, পরকাল নিছক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। আধুনিক মতবাদ হিসেবে বস্তুবাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে এ মতবাদ চরম জাহেলিয়াত। এ মতবাদকে সত্য বলে স্বীকার করলে মানুষের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। ইসলামের মতে, মানবদেহটি বস্তুগত সত্তা হলেও আসল মানুষটি বস্তু নয়, তা রূহ। আর রূহ হলো নৈতিক সত্তা। ভালো ও মন্দের বিচারবোধ বা বিবেকের অস্তিত্বকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? বিবেককে জড় পদার্থ বলে দাবি করার কী যুক্তি থাকতে পারে?


www.amarboi.org

বিশ্বে কি বস্তুই সবকিছু? ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, দয়া ইত্যাদির কি কোন অস্তিত্ব নেই? বস্তুজগৎ নিয়ে গবেষণায় তৎপর ল্যাবরেটরি কি এসব নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম? এসবই বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। অথচ এ সবের অস্তিত্ব মানব জীবনে স্বীকৃত মহাসত্য। সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগ, দেশের জন্য আত্মত্যাগের জযবাকে অস্বীকার করা কি সম্ভব? এসব অস্তিত্ববান হলেও বিজ্ঞানের নাগালের মধ্যে পড়ে না। তাই বস্তুর উর্ধ্বেও সত্যের অস্তিত্ব রয়েছে।

## কৌতুকের বিষয়

প্রসঙ্গক্রমে একটি কৌতুকের বিষয় আলোচনা করতে চাই। হেগেলের ডাইলেকটিজম ও হিউমের মেটেরিয়েলিজমের সমন্বয়ে কমিউনিউজমের আবিষ্কারক কার্ল মার্কস্ ও তার যোগ্য শ্রেষ্ঠ অনুসারী লেনিন ডাইলেকটিকেল মেটেরিয়ালিজম (Dialectical Materialism) নামে এক মতবাদ ঘোষণা করেন, যা তাদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অত্যন্ত সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়।

গত নব্বই'র দশকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পিতৃভূমি রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের চমকপ্রদ আত্মহত্যার পর তাদের স্বীকৃত দ্বন্দ্ববাদ ও জড়বাদেরও মৃত্যু হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ঐ দুটো মতবাদকে ভিত্তি হিসেবেই বাস্তবে মেনে চলছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ও বাহকগণ তাদের বৈজ্ঞানিক বিরাট অগ্রগতি ও প্রযুক্তিগত বিস্ময়কর উন্নতিকে পুঁজি করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অধিকারী হয়ে চরম অহংকারী হয়ে পড়েছে। মানবতা, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি জড়বাদবিরোধী বিষয় বিবেচনা করার কোন প্রয়োজন তারা বোধ করে না।

## পঞ্চমতঃ আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে

ইসলামী সভ্যতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো আখিরাতের জওয়াবদিহিতা। মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এর নৈতিক ফল মৃত্যুর পরকালীন জীবনে পাওয়া যাবে। এ বিশ্বাস ছাড়া কারো পক্ষেই নৈতিক মান রক্ষা করে নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন সম্ভব নয়।

খ্রিস্টধর্মে আখিরাতে বিশ্বাসের ধারণা থাকলেও গডকে ফাঁকি দিয়ে পার পাওয়ার উপায় তারা আবিষ্কার করে নিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, যিশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুতে বিশ্বাসী মানুষের সকল পাপের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) আদায় করে গেছেন। তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস থাকলেই যথেষ্ট। তাদের এ বিশ্বাস তাদেরকে পাপ করার ও.জি.এল. দিয়ে দিয়েছে। ক্ষমা যখন নিশ্চিত তখন পাপে দ্বিধা থাকবে কেন?

ইসলামে Honesty is a value. আর পাশ্চাত্য সভ্যতায় Honesty is a policy. অর্থাৎ ইসলামের মতে সর্বাবস্থায় সততা অবলম্বন করতে হবে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় নীতি হিসেবে সততাকে লাভজনক বলে গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায়ে উন্নতির স্বার্থে সততা প্রয়োজন; কিন্তু যদি ধরা পড়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে সততা জরুরি নয়।


www.amarboi.org

অসৎ উপায়ে উন্নতি করতে বাধা নেই, যদি আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। আইন, পুলিশ ও লোকলজ্জার ভয়ে সততা পালন করা হয়ে থাকে। ইসলামী নৈতিকতা অনুযায়ী আল্লাহর ভয়ে সৎ থাকতে হবে, যাতে আখিরাতে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ আইন ও পুলিশ নাগাল না পেলেও এবং অন্য কোন মানুষ না দেখলেও আল্লাহ্ সর্বাবস্থায় দেখছেন। তাঁকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই– এ বিশ্বাসই নৈতিকতা মেনে চলতে বাধ্য করে।

কুরআনে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জওয়াবদিহিতার চেতনা ছাড়া কোন মানুষ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা এ চেতনার ধারই ধারে না।

## ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য (সারকথা)

উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিগত দূরত্ব বিরাট। ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি হলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো সেক্যুলারিজম, ডেমোক্রেসি, ডাইলেকটিজম ও মেটেরিয়েলিজম। এসব মৌলিক ভিত্তির দিক দিয়ে ইসলামী সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা। এদের মধ্যে সমন্বয়ের বা সমঝোতার কোন উপায় নেই।

সুতরাং উভয় সভ্যতার কৃষ্টি বা কালচারে বিরাট পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক কাঠামোতে, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, বৈধ ও অবৈধের (হালাল ও হারাম) বিধান সম্পর্কে, আনন্দ ও বিনোদন উপভোগের ধরনের ব্যাপারে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে ইসলামী সভ্যতার যে ভিত্তি প্রদান করেছে, যারা তা মেনে চলে তাদের চরিত্রে নিম্নরূপ গুণাবলি দেখা যায় ঃ

১. তারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে, রাসূল (স)-কে অনুসরণ করে, আখিরাতে আল্লাহর নিকট দুনিয়ায় কৃত যাবতীয় কর্মের হিসাব দিতে হবে বলে সর্বদা সতর্ক হয়ে জীবন-যাপন করে।

২. তারা অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে সম্পদ হাসিলের চেষ্টা করে না ও কারো সাথে প্রতারণা করে না।

৩. কারো উপর তারা সামান্য অন্যায়ও করে না, যুলুম করার তো প্রশ্নই ওঠে না। কোন মানুষ তাদের আচরণে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট পায় না।

৪. বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া তারা অন্য কোন মহিলার সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা তো দূরের কথা, ইসলাম যেসব মহিলার দিকে তাকাতে নিষেধ করেছে তাদের দিকে


www.amarboi.org

দৃষ্টি পড়া মাত্র চোখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তি দেখা দেয় না। তারা স্ত্রীর যাবতীয় অধিকার আদায় করে।

৫. ইসলাম দুনিয়াকে ভোগ করার যতটুকু অধিকার দিয়েছে এবং যে নিয়মে ভোগ করার অনুমতি আছে, একমাত্র ততটুকুই ঐ নির্ধারিত নিয়মে ভোগ করে। তারা বৈরাগ্য অবলম্বন করে না। অথচ ভোগবাদীদের মতো লাগামহীনও হয় না। তারা বিনোদন ও আনন্দ উপভোগ করার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশিত নৈতিক সীমা লঙ্ঘন করে না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এমন একটি দেশে ইসলামী জীবন বিধান জনগণের নিকট পেশ করেন, যে দেশে সেকালের সভ্য দুনিয়ার (রোম ও পারস্য সভ্যতা) কোন আলো পৌঁছেনি। সভ্য দুনিয়া তাদেরকে বর্বর জাতি বলেই মনে করতো। তারা বংশানুক্রমিকভাবে গোত্রে গোত্রে মারামারি, কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিলো। লেখাপড়ার চর্চা ছিলো না বললেই চলে। জনগণের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা কায়েম ছিলো না। কারণ দেশে কোন সরকারের অস্তিত্বই ছিলো না।

এমন একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাসূল (স) ইসলামী শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে গোটা আরবে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম হয়ে গেলো, যা মানব জাতির ইতিহাসে সেরা কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত। রাসূল (স)-এর শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তাদের চরিত্রে উপরিউক্ত গুণাবলি সৃষ্টি হওয়ার ফলেই আরবের বর্বর জাতি উন্নত সভ্য জাতিতে পরিণত হয়। ইসলামী সভ্যতায় সমৃদ্ধ এ জাতি কিছুদিনের মধ্যেই রোম ও পারস্য সভ্যতার উপর বিজয় লাভ করে। ইসলামী সভ্যতা একটি বর্বর জাতিকে সভ্যতার উস্তাদ জাতিতে পরিণত করে। এ কারণে মাইকেল হার্ট তাঁর লেখা 'দি হানড্রেড' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মানবজাতির ইতিহাস থেকে বাছাই করা ১০০ জন মনীষীর মধ্যে মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিসমূহকে যারা সঠিক বলে গ্রহণ করে তাদের চরিত্র নিম্নরূপ হওয়াই স্বাভাবিক ঃ

আল্লাহর নিকট থেকে কোন জ্ঞান নেবার প্রয়োজনবোধ করে না বলে তাঁরা নাফসের গোলাম হতে বাধ্য। নাফস মানে দেহের দাবির সমষ্টি। দেহের যাবতীয় দাবি পূরণ করতে তারা বিনা বাধায় তৎপর হয়। দেহের কোন নৈতিক চেতনা না থাকায় তারা নৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত অবস্থায় বস্তুজগৎকে ভোগ করতে থাকে।

সকল মানুষের মধ্যেই নৈতিক চেতনা রয়েছে। এ চেতনাই আসল মানুষ। তাই দেহের দাবি পূরণের পথে নৈতিক চেতনা অবশ্যই আপত্তি করে। কিন্তু তারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং আখিরাতের পরওয়া করে না বলে ঐ চেতনা সর্বাবস্থায়


www.amarboi.org

সক্রিয় থাকে না। আইন ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং লোকলজ্জার আশঙ্কা না থাকলে বিবেকের বিরুদ্ধে দেহের দাবি পূরণ করতে তারা দ্বিধা বোধ করে না।

তারা স্বাভাবিক কারণেই গ্রিক দার্শনিক Epicurus-এর ভোগবাদী দর্শনের অনুসারী হয়ে যায়। তিনি এ দর্শনের আবিষ্কারক যে, মানব জীবনের আসল লক্ষ্যই হলো উপভোগ (Pleasure)। এই এপিকিউরিয়ান ফিলসফির শ্লোগানই হলো, "Eat, drink and be merry" খাও, দাও, ফুর্তি করে বেড়াও। এটাই তাদের জীবনের নেশা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় কিছু জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য হয় না। অবশ্য যারা চিন্তাশীল, গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, লেখক, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকলেও তাদের অবসর সময়ে ও অবকাশকালে ঐ ভোগবাদী মনোভাবই প্রাধান্য লাভ করে।

তাদের মধ্যে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌনসম্পর্ক আইনসিদ্ধ বলে স্বীকৃত। তাই তাদের পারিবারিক জীবন সুখময় হতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই মনে করে যে, তাদের জীবনসাথী অন্যের শয্যাসঙ্গী হতে পারে। এটাকে তারা দূষণীয় মনে করে না। তাদের কোন সন্তানের পিতা কে তা নিশ্চিত নয় বলেই তাদের পাসপোর্টে শুধু মায়ের নাম লিখা থাকে, পিতার নাম থাকে না। কারণ মা-ই শুধু নিশ্চিত জানা। কুমারী মাতার সংখ্যাও প্রচুর। তাদের দাম্পত্য জীবন স্থায়ী নয়, ব্যাপক হারে তালাক হয়।

নৈতিক উন্নয়নের চর্চা না থাকায় এবং আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জওয়াবদিহিতার চেতনার অভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মতো যোগ্য ও জাঁদরেল প্রেসিডেন্ট, হিলারীর মতো সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী হওয়া সত্ত্বেও হোয়াইট হাউজে কর্মরত মনিকা লিউনস্কিকে তার শয্যাসঙ্গী হতে বাধ্য করেন। মনিকা যখন তা প্রকাশ করে দেন তখন প্রেসিডেন্ট প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসার আশঙ্কা দেখা দিলে জাতির নিকট ক্ষমা চেয়ে তিনি রেহাই পান। তাঁর যোগ্যতার খাতিরে তাঁকে ক্ষমা করা হয়।

আমি পত্রিকায় এ খবরটি পড়ে অত্যন্ত বিস্মিত হই যে, এতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চলন্ত বিমানে এয়ার হোস্টেসও তাঁর যৌন পীড়নের শিকার হতে বাধ্য হয়।

পারিবারিক জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা নেই বলে তাদের জীবনে বৃদ্ধ বয়সটা রীতিমতো অভিশাপ ও দুর্বিষহ। মুসলিম সমাজে বৃদ্ধ পিতামাতা যে সম্মান, যত্ন, মহব্বত উপভোগ করে তা পাশ্চাত্যে কল্পনাও করা যায় না। বৃদ্ধরা পরিবারে সবচেয়ে অবহেলিত।


www.amarboi.org

তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ দেশে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার স্বার্থে যতই জনকল্যাণমূলক কাজ করুক, নিজ দেশের স্বার্থে অন্য দেশের উপর চরম যুলুম করাকে কৃতিত্ব মনে করে। তাদের দেশের স্বার্থে অন্য দেশে গণহত্যা চালাতে সামান্য দ্বিধাও বোধ করে না। নীতির দিক দিয়ে তারা ডবল স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলে। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মাপকাঠি নিজেদের দেশের জন্য এক রকম, অন্য দেশের জন্য ভিন্ন রকম। তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান মনে করে বলে বিশ্বের সকল খ্রিস্টানদের জন্য তাদের পলিসি এক রকম, আর সকল মুসলিমদের জন্য অন্য রকম।

যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতার ধারকরা সতর্কতার যে বিধান মেনে চলে, পাশ্চাত্য এর কোন ধারই ধারে না। ইসলাম সাধারণ মানুষ হত্যা করা, বিশেষ করে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। প্রতিপক্ষের যুদ্ধরত লোকদের বাইরে কোন মানুষ হত্যার অনুমতি ইসলামে নেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকরা যেখানেই যুদ্ধ করে সেখানে নির্বিচারে গণহত্যা চালায়, জনবসতি পাইকারি হারে ধ্বংস করে এবং নির্দ্বিধায় চরম হিংস্র আচরণ করে। যুদ্ধবন্দিদের সাথে পশুসুলভ জঘন্য নির্যাতন চালায়।

## আমেরিকার বর্তমান অভিযান

পাশ্চাত্য সভ্যতার নিষ্ঠাবান অভিভাবক হিসেবে ইসলামী সভ্যতার পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার জন্য প্রফেসর হান্টিংটন যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সেই মহান উদ্দেশ্যেই মহাপরিকল্পনা নিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন করা পবিত্র কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সকল মুসলিম দেশের জনগণ ইসলামের পুনর্জাগরণ চায়। সব মুসলিম দেশেই ইসলামী আন্দোলন ঐ উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ইরান, সুদান ও আফগানিস্তানে জনগণের ব্যাপক সমর্থনে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ায় আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শক্তি অন্যান্য মুসলিম দেশে গণতন্ত্রকে প্রতিহত করাই নিরাপদ মনে করছে। মিসরে একদলীয় শাসনকে এবং আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ায় স্বৈরশাসনকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে টিকিয়ে রাখছে। তুরস্কে কামাল পাশার আদর্শের ধারক সেনাবাহিনী নির্বাচিত সরকারকে জনগণের ইসলামী দাবি পূরণ করতে দিচ্ছে না। পাকিস্তানে একই ব্যক্তি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও সেনাপ্রধান হিসেবে গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেই আমেরিকা সন্তুষ্ট। আরব দেশগুলোতে তো গণতন্ত্রের বালাই-ই নেই। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রতিহত করার দায়িত্ব ভারতের হাতে দেওয়া হয়েছে। ভারত তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে সে দায়িত্ব পালন করছে।

মুসলিম শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আমেরিকা মাদরাসার সিলেবাস সংশোধনের দাবি জানিয়েছে। কারণ মাদরাসাসমূহ নাকি মৌলবাদী তৈরির


www.amarboi.org

কারখানা। মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা কখনও সেক্যুলার আদর্শে বিশ্বাসী হবে না। এ কারণেই শেখ হাসিনা মাদরাসার বিরুদ্ধে এতো ক্ষিপ্ত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বুশ ইসলামের কারণে ইরাকে হামলা করেননি। ইরানকে খতম করার জন্য সিনিয়র বুশ (জর্জ বুশের পিতা) প্রেসিডেন্ট থাকাকালে সাদ্দাম হোসেনকে যেসব WMD (Weapons of Mass Destruction—গণহত্যার যোগ্য অস্ত্র) দিয়েছিলেন সেসব যাতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সম্ভব না হয় সে উদ্দেশ্যে ঐসব কেমিক্যাল ও বাইওলজিক্যাল অস্ত্র ধ্বংসের দোহাই দিয়ে ইরাক আক্রমণ করা হয়। ইসরাঈলের অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাপারে তিনি এতোটা পাগল হয়ে গেলেন যে, জাতিসংঘের বিরোধিতা সত্ত্বেও একক সিদ্ধান্তে জর্জ বুশ ইরাক আক্রমণ করেন। অস্ত্র পাওয়া না যাওয়া সত্ত্বেও তিনি ইরাক হামলাকে বৈধ বলে দাবি করছেন। অবশ্য জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বিলম্বে হলেও ঐ হামলা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

## সন্ত্রাস দমনের অজুহাত

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য বিনা তদন্তে ও বিনা প্রমাণে প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ উসামা বিন লাদেনকে দায়ী করেন এবং সারাবিশ্বে ইসলামী মৌলবাদীদেরকে দমন করার জন্য ক্রুসেড ঘোষণা করেন। আমেরিকান পাইলটদের পরিচালনায় দুটো আমেরিকান বিমানের আত্মঘাতী হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হলো। এতো বড় ধ্বংসাত্মক কর্ম করার কোন ক্ষমতা উসামা বিন লাদেনের থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আফগানিস্তানের ইসলামী সরকারের মেহমান হিসেবে তিনি সেখানে ছিলেন। তাঁকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে আফগান সরকার প্রধান মোল্লা ওমর অস্বীকার করার অপরাধে জর্জ বুশ আফগানিস্তানে নৃশংস পাশবিক হামলা করে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এরপর অপর এক অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করে।

এসব অভিযান সন্ত্রাস নির্মূলের নামেই চালানো হচ্ছে। অথচ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সন্ত্রাস ছড়াবার অপরাধে আমেরিকাই এক নম্বর দোষী। ১৯৪৮ সালে আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেন ফিলিস্তিনে ১২০০ বছর থেকে বসবাসরত আরব মুসলমানদেরকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইহুদীদের জন্য ইসরাঈল রাষ্ট্র কায়েম করে দেয়। ফিলিস্তিনিরা তাদের জন্মভূমির আযাদী পুনরুদ্ধারের জন্য যে লড়াই করছে তাকে সন্ত্রাস ঘোষণা করে আমেরিকা ইসরাঈলকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালাতে দিচ্ছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৯ সালে কাশ্মীরের জনগণকে গণভোটের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত দেয়। ভারত জাতিসংঘের ঐ সিদ্ধান্ত


www.amarboi.org

বাস্তবায়ন না করায় কাশ্মীরের জনগণ আযাদী আন্দোলন করছে। ভারত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে তা দমন করছে। অথচ আমেরিকা কাশ্মীরের আযাদী আন্দোলনকেও সন্ত্রাস বলে রায় দিয়েছে।

আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকা যে বর্বর গণহত্যা চালাচ্ছে এর চেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর কী হতে পারে?

আসলে সন্ত্রাস দমনের অজুহাতে আমেরিকা ইসলামী সভ্যতার উত্থানকে ঠেকাবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে ক্রুসেড হিসেবে অভিযান চালাচ্ছে। প্রফেসর হান্টিংটনের সুচিন্তিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্রত নিয়েই জর্জ বুশ এগিয়ে চলছেন। ২০০৪-এর নভেম্বরে আমেরিকার জনগণ তাদের সভ্যতার প্রতাপ বহাল রাখার উদ্দেশ্যেই জর্জ বুশকে পুনর্নির্বাচিত করলো।

## মুসলিম উম্মাহর আসল সংকট

১৭৫৭ সালে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের যোগ্যতার কারণে বিপন্ন হয়নি। নবাব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলীর মুনাফিকীর দরুনই স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। ক্লাইভ তার জাতির জন্য হিরোর ভূমিকা পালন করেছে এবং বিজয়ী হয়েছে। আমরা ক্লাইভকে দোষ দিয়ে তৃপ্তিবোধ করি। আমরা যদি নিজেদের মর্যাদা ফিরে পেতে চাই তাহলে আমাদের ঘরের শত্রু মীর জাফরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার হিম্মত করতে হবে।

আজ মুসলিম উম্মাহর আসল সংকট জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ার বা পুটিন নয়; মুসলিম দেশগুলোর শাসকরাই আসল মুসীবত।

বিশ্বে ৪৫টি স্বাধীন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ রয়েছে। কয়েকটি দেশ ছাড়া বাকি সব কয়টি দেশে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা তাদের নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য আমেরিকার সমর্থন অপরিহার্য মনে করেন। ইসলামী সভ্যতাকে বিজয়ী করার কোন পরিকল্পনাই তাদের নেই। অথচ সত্যিকার মুসলিম হিসেবে দাবি করলে কুরআন অনুযায়ী তাদের প্রধান কর্তব্য হলো, মানবজাতির নিকট ইসলামের বাস্তব রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রূপ তুলে ধরা। সূরা আল হাজ্জের ৪১ নং আয়াতে মুসলিম শাসকদের জন্য আল্লাহ স্বয়ং যে চারদফা কর্মসূচি দিয়েছেন তা যদি তারা নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন তাহলে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে আমেরিকার সন্তুষ্টির কাঙাল হতেন না।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যারা ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করছেন তাদেরকে সরকার তাদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতারা তাদেরকে মৌলবাদী বলে গালি দেন এবং তাদেরকে দমন করার জন্য মুসলিম নামধারী সরকারকে চাপ দেন।


www.amarboi.org

যদি মুসলিম দেশের সরকারসমূহ ইরান ও সুদানের মতো ইসলামের ধারক ও বাহক হতো তাহলে আমেরিকা তাদেরকে সমীহ করতে বাধ্য হতো। আমেরিকা তাদের মাধ্যমেই ইসলামকে প্রতিহত করছে। ও.আই.সি. (অর্গেনাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স)-এর ৫৭টি সদস্য দেশের মধ্যে ৪৫টিই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঐসব দেশের সরকারই সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। যদি তাদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী জযবা থাকতো তাহলে ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, মিন্দানাও, রোহিঙ্গা ইত্যাদি সমস্যার সমাধান জাতিসংঘের মাধ্যমেই করা সম্ভব হতো। জাতিসংঘের ও.আই.সি-এর অন্তর্ভুক্ত ৫৭টি দেশ বিরাট এক শক্তি। যদি তারা মুসলিম হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতো, তাহলে আমেরিকা এভাবে আফগানিস্তান ও ইরাক দখল করতে সাহস পেতো না।

তাই মুসলিম উম্মাহর আসল সংকট অমুসলিমদের কারণেই নয়; মুসলিম দেশের নেতৃত্বে মুসলিম নামধারী যারা রয়েছেন তারাই এ সংকটের জন্য আসল দোষী।

এ সংকটের মূল কারণ হলো মুসলিম জনগণকে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবার অভাব। মুসলিম সরকার পরিচালকরা যদি মন-মগজ-চরিত্রে মুসলিম হতেন তাহলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে যারা মুসলিম তাদেরকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবার দায়িত্ব বোধ করতেন।

মুসলিম নামধারী হলেই ইসলামী সভ্যতার অনুসারী বলে গণ্য হতে পারে না। মানুষের সন্তান মানুষের আকৃতিরই হয়; গরুর আকৃতির হয় না। কিন্তু মুসলিমের সন্তান হলেই মুসলিম হয়ে যায় না। ইসলামের আদর্শ গ্রহণ করেই মুসলিম হতে হয়। কাফিরের সন্তানও নবী হয়েছেন, আবার নবীর সন্তানও কাফির হয়েছে। মুসলমানিত্ব কতক গুণের সমষ্টি, যা অর্জন করতে হয়। জন্মগতভাবে তা কেউ লাভ করে না। যেমন ডাক্তারের সন্তান জন্মসূত্রে ডাক্তার নয়। ডাক্তারি গুণ অর্জন করা ছাড়া ডাক্তার বলে গণ্য হতে পারে না।

মুসলিম দেশের নেতৃত্বে যারা আছেন, তারা ইসলামী সভ্যতার ধারক নয় বলেই মুসলিম জাতির মধ্যেও ইসলামী কৃষ্টির দৈন্য দেখা যায়। ইরান ও সুদানে ইসলামী সভ্যতার উত্থানের প্রচেষ্টা চলছে। সকল মুসলিম দেশেই ইসলামী আন্দোলন এ উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আফগানিস্তানে ইসলামের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টাকে এক খোঁড়া অজুহাতে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরান ও সুদানকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সকল মুসলিম দেশের সরকারই যদি ইসলামী সভ্যতার ধারকের ভূমিকা পালন করতো তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষ থেকে এমন নগ্ন হামলা সহজ হতো না।


www.amarboi.org

## হান্টিংটনের দাবি

প্রফেসর সেমুয়েল হান্টিংটন তার উক্ত গ্রন্থে দাবি করেছেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন। তিনি এর নিম্নরূপ বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন ঃ

১. পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকার দোসরের ভূমিকা পালন করছে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। এদের ভাষা হলো ইংরেজি। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। বিশ্বের সকল দেশে ইংরেজি ভাষা শেখার প্রতিযোগিতা চলছে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য কৃষ্টি (কালচার) বিশ্বকৃষ্টিতে পরিণত হচ্ছে।

   হান্টিংটন এতে আত্মতৃপ্তি বোধ করছেন তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে তার জানা উচিত যে, এক সময় আরবী ভাষা পৌত্তলিক কালচারেরই বাহন ছিলো। কিন্তু আরবরা যখন ইসলামী সভ্যতা গ্রহণ করলো তখন ঐ ভাষাকেই মুসলমান বানিয়ে ফেললো। ভাষা কৃষ্টির বাহন মাত্র; সভ্যতার ভিত্তি নয়। তাই ইংরেজি ভাষা বিশ্বজনীন হয়ে গেলেও ইসলামী সভ্যতার বিকাশকে ঠেকাতে পারবে না। মুসলিমরা এ ভাষাকেও ইসলামাইজ করে ফেলবে।

২. পাশ্চাত্যের পোশাক মুসলিম বিশ্বেও ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে। এটাও পাশ্চাত্য কালচারের বিশ্বজনীন হবার প্রমাণ বহন করে। একথা সত্য যে, আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্য পোশাক ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। তবে সকলের মধ্যে জনপ্রিয় হয়নি। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের মধ্যে পাশ্চাত্য পোশাক মোটেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। হান্টিংটনের মনে রাখা উচিত যে, পোশাকও কালচার মাত্র; সভ্যতার ভিত্তি নয়। পৌত্তলিক আরবদের পোশাককেও আরব মুসলিমরা ইসলামীকরণ করে নিয়েছিলেন।

৩. হান্টিংটন দাবি করেছেন যে, প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে পাশ্চাত্য উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে, পাশ্চাত্যের পণ্যদ্রব্য বিশ্বের সর্বত্র জনপ্রিয় হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দরুন সব দেশের মানুষ পাশ্চাত্যে যাতায়াত করছে এবং তারা পাশ্চাত্যের উন্নত কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। বিশ্বের সব দেশ থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উচ্চশিক্ষার জন্য যারা আসছে তারাও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে।

   হান্টিংটনের এ দাবি উড়িয়ে দেওয়া যায় না বটে; কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম আছে। যারা মুসলিম তাদের মধ্যে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি সম্পর্কে যারা সচেতন, তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিকে মোটেই গ্রহণযোগ্য মনে করে না। এমনকি পাশ্চাত্যে যেসব মুসলিম স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তাদের মধ্যেও ইসলামী সভ্যতার প্রতি গভীর বিশ্বাসী লোক রয়েছে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি ইউরোপ ও


www.amarboi.org

আমেরিকায় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারমাধ্যমে চরম বিদ্বেষ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বেশ সংখ্যায় খ্রিস্টানরা ইসলাম গ্রহণ করছে। কিন্তু কোন মুসলিম মানবিক দুর্বলতার কারণে পাশ্চাত্য কালচারে আকৃষ্ট হলেও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে না।

আল্লাহর কুরআন, রাসূল (স)-এর সুন্নাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অবিকৃত অবস্থায় মুসলিম জাতির নিকট সংরক্ষিত আছে। ইসলামী আন্দোলন গোটা বিশ্বে সক্রিয় রয়েছে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম জনগণের মধ্যে তাদের প্রতি সমর্থন ব্যাপকতর হচ্ছে। এ কারণেই তো প্রফেসর হান্টিংটন ইসলামকে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য বিরাট হুমকি মনে করছেন এবং আমেরিকা ইসলামের পুনরুত্থানকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকা যে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে তাতে তাদের এ পথে আরও অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা হওয়ারই কথা।

## পাশ্চাত্য সভ্যতা মানব জাতিকে আর কী দিতে পারবে?

ইতিহাস এ কথার বলিষ্ঠ সাক্ষী যে, বিশ্বে যখন মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ময়দানে তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। পাশ্চাত্য জগতে তখন সভ্যতার ছোঁয়াই লাগেনি। আজ যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উন্নত শিক্ষার জন্য মুসলিমরা পাশ্চাত্যে যেতে বাধ্য হয়, তেমন ঐ সময় পাশ্চাত্য দেশ থেকে উন্নত শিক্ষার জন্য মুসলিমদের পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী হিসেবে আসতো। মুসলিম জাতি যখন ভোগ বিলাসে লিপ্ত হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় অবহেলা করলো, তখন পাশ্চাত্যে তাদেরই শাগরিদরা সাধনা-গবেষণায় এগিয়ে গেলো। ঐ অগ্রগতির ফলেই তারা ১৮ ও ১৯ শতাব্দীতে মুসলিম দেশগুলোকে দখল করতে সক্ষম হয়।

পৃথিবীতে যতদিন ইসলামী সভ্যতার নেতৃত্ব চালু ছিলো ততদিন মানব জাতির জীবনে তেমন কোন বিপর্যয় দেখা দেয়নি। কারণ ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ তাদেরকে অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখতো। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য কায়েম হবার পর মানব জাতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কারণ তারা Divine Guidance-এর ধার ধারে না বলে "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি অনুযায়ী যে দেশই দখল করেছে সেখানে জনগণকে চরমভাবে নির্যাতন করেছে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জঘন্য পাশবিক আচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বর্তমানে ইরাক ও আফগানিস্তানে এর প্রমাণ জ্বলন্ত দেখা যাচ্ছে।

আফ্রিকা থেকে কালো মানুষদেরকে দলে দলে শিকারি পশুর ন্যায় বন্দি করে তারা আমেরিকায় নিয়ে দাস হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিজিত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে ইউরোপের দেশসমূহ সমৃদ্ধ হয়েছে। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে অন্যান্য দেশকে পরাধীন করে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। বিশ্বকে বিজ্ঞানের


www.amarboi.org

উন্নতির ফসল ও উন্নত প্রযুক্তি তারা অবশ্যই দিয়েছে; কিন্তু এসব কি মানবতার কল্যাণে লেগেছে?

এখানে মাওলানা মওদূদী (র)-এর লেখা থেকে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে উপরিউক্ত প্রশ্নের জওয়াব দিতে চাই। একই মানের ইস্পাত দিয়ে দুটো ছুরি তৈরি করা হলো। একটি ছুরি সিভিল সার্জনের হাতে গেলো, অপরটি ছিনতাইকারী বা ডাকাতের হাতে পড়লো। একই মানের ছুরি বটে, কিন্তু ব্যবহারকারী একই মানের নয়। একজনের ছুরি জীবন রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর একজনেরটা জীবন হরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে ছুরির কোন দোষ নেই। ছুরিকে মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাটাই অপরাধ; ছুরি অপরাধী নয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারকদের নৈতিক মান উন্নত নয়। কারণ তারা আল্লাহর দেওয়া মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়, পরকালে জওয়াবদিহি করার চেতনাও তাদের নেই। তাই তারা উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিশ্বে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করাকেই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবতার প্রতি কী অবদান রেখেছে? তারা দুটো বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতিকে উপহার দিয়েছে। এটমিক শক্তিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুহূর্তে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করেছে। তাদের যাবতীয় শক্তি সন্ত্রাসী উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করছে। ফিলিস্তিনের আরব মুসলিম অধিবাসীদেরকে জোর করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের সকল ইহুদীদেরকে সেখানে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। এটা মানবতার কোন্ ধরনের খিদমত? আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার বিশাল অনাবাদি এলাকায় ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্য স্থান বরাদ্দ করা যেতো।

সন্ত্রাসীরা নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থে অস্ত্র ও বোমা ব্যবহার করে থাকে। আমেরিকা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী ভূমিকা পালন করে আফগানিস্তান ও ইরাকে হিংস্র পশুর মতো আচরণ করছে। শক্তি প্রয়োগ করে অপরের অধিকার হরণ করা যদি সন্ত্রাস বলে গণ্য হয় তাহলে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে আমেরিকা যা করছে তা কেন সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে না?

আমার বাড়িতে যদি কেউ হামলা করে তাহলে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ করা আমার আইনগত অধিকার। বিশ্বের সর্বত্র এ কথা স্বীকৃত। ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে বহিরাগত যারা হামলা করেছে তাদেরকে ওখানকার অধিবাসীদের প্রতিহত করার সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাক জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্যায় দখলদারকে প্রতিরোধ করা তাদের স্বীকৃত অধিকার। অথচ অন্যায় দখলকারীরা প্রতিরোধকারীদেরকে সন্ত্রাসী বলে দোষী সাব্যস্ত করে বোমা হামলা করে জনগণের সম্পদ ও বাড়িঘর ধ্বংস করছে ও নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে।


www.amarboi.org

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে হবেন, এর ফায়সালা করার অধিকার সে দেশের জনগণের। কিন্তু জর্জ বুশ তিন বছর আগে (২০০১) সালে নির্লজ্জের মতো ঘোষণা করলেন যে, ফিলিস্তিনের নেতা হওয়ার যোগ্যতা আরাফাতের নেই। তাই তার সাথে আলোচনা করবো না। ইরাকের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে এর ফায়সালা করার অধিকার জর্জ বুশকে কে দিলো? প্রত্যেক দেশে সরকার পদ্ধতি জনগণের ইচ্ছায়ই চালু হয়ে থাকে। ইরাকের জনগণকে গণতন্ত্র উপহার দেবার দায়িত্ব জর্জ বুশকে কি সে দেশের জনগণ দিয়েছে?

জর্জ বুশের নেতৃত্বে আমেরিকা জাতিসংঘের অনুমতি ছাড়াই ইরাক আক্রমণ করে প্রমাণ করলো যে, লীগ-অব-নেশনকে অকার্যকর করে হিটলার যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিলেন, জর্জ বুশও জাতিসংঘকে অবহেলা করে মানব জাতিকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিতে প্রস্তুত। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবতা ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন অবদান রাখার যোগ্য নয়।

## তথাকথিত লিবারেল ডেমোক্রেসিই পাশ্চাত্য সভ্যতার একমাত্র মূলধন

আমেরিকা পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে। পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েট-রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকা মনে করছে যে, তাদের উদার গণতন্ত্রই মানবজাতির একমাত্র আদর্শ। বিশ্বের সবাই এ আদর্শ মেনে নিতে বাধ্য। কারণ তাদের মতে, আর কোন আদর্শ বিশ্বে নেই। এ গণতন্ত্র এতো উদার যে, মনুষ্যত্ব ত্যাগ করে পশুত্ব গ্রহণের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের রায় হলে, তা-ই সঠিক বলে স্বীকার করতে হবে।

ইসলাম তাদের এ মহান আদর্শের বিরোধী বলে আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধেই ক্রুসেড শুরু করেছে। কিন্তু তারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি সম্পর্কে অবহিত বলে মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের তল্পীবাহক মুসলিম নামধারী শাসকদেরকে উপদেশ দিচ্ছে যে, আসল ইসলামকে 'মৌলবাদ' বলে দমন করতে হবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টির সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো লিবারেল ইসলামের প্রচলন করতে হবে। ইসলাম শব্দের সাথে মুসলিম জনগণের প্রবল আবেগ জড়িত। তাই ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত নয়। তোমরা লিবারেল ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে জনগণকে নেতৃত্ব দাও, যাতে মৌলবাদী বা মিলিট্যান্ট ইসলামের নেতৃত্ব দেশে কায়েম হতে না পারে।

মজার ব্যাপার হলো, আমেরিকা মুসলিম দেশে গণতন্ত্রকেও নিরাপদ মনে করতে পারছে না। কারণ জনগণ স্বাধীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ পেলে মৌলবাদীদের নেতৃত্ব মেনে নেবার আশঙ্কা রয়েছে। আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়ায় গণতন্ত্রের দুশমনরাই আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে শাসন করছে। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান পারভেজ মোশাররফকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে জর্জ বুশ গণতন্ত্রের অভিভাবক হিসেবে হোয়াইট হাউজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। (৪/১২/০৪)


www.amarboi.org

## আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি মুসলিম বিশ্বেরও কর্তা

আমেরিকা এটম বোমাসহ বিশ্বকে ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় মারণাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডারের অধিকারী। তাদের পোষ্য ইসরাঈলও আণবিক বোমায় সমৃদ্ধ। আণবিক বোমার অধিকারী হওয়ার অধিকার কোন মুসলিম দেশের আছে বলে তারা স্বীকার করতে রাজি নয়। পাকিস্তান ও ইরানের উপর আমেরিকা প্রবল চাপই শুধু নয়, ধমকের সুরে আণবিক গবেষণা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ভারতকে সামান্য চাপও দেওয়া হচ্ছে না। উত্তর-কোরিয়াকে ধমক দেবার সাহসও দেখাচ্ছে না। মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা আমেরিকার নিরঙ্কুশ আনুগত্য করার কারণেই এমন আচরণ করছে।

এ আচরণ সুস্পষ্ট ও জঘন্য সন্ত্রাসের প্রমাণ বহন করে। বিশ্বকে সন্ত্রাস উপহার দেবার যোগ্যতাই তাদের রয়েছে। কোন কল্যাণকর অবদান পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ও বাহকদের নিকট আশা করা যায় না।

তাই মানব জাতির কল্যাণকর ভবিষ্যৎ একমাত্র ইসলামী সভ্যতার উত্থানের উপরই নির্ভর করে। মুসলিম উম্মাহর এটা বিরাট দায়িত্ব। ইসলামী আন্দোলনসমূহ নিজ নিজ দেশে ইসলামকে বিজয়ী করতে সক্ষম হলে ইসলামী সভ্যতার পতাকা বিশ্বে আবার উড্ডীন হতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহকদের সন্ত্রাস থেকে মানবজাতির মুক্তির জন্য ইসলামী সভ্যতার বিজয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড